শারদীয়া
১৪৩২

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ত্রৈমাসিক

আনন্দ অঙ্গন

শুভ
দীপাবলি
১৪৩২

বর্ষ-১২, সংখ্যা: ৪ | AANANDA AANGAN | অক্টোবর, ২০২৫

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পকলা

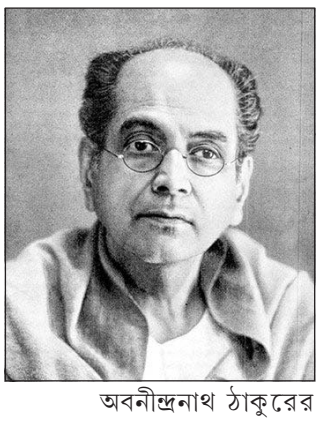

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পকলা ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় শৈলীকে আধুনিকীকরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট নামে পরিচিত। তিনি মুঘল ও রাজপুত রীতির আধুনিকীকরণ করে পাশ্চাত্য শিল্পের প্রভাব মোকাবেলার চেষ্টা করেন এবং তাঁর কাজের মধ্যে ছিল 'ভারত মাতা' (১৯০৫), 'শকুন্তলা' ও 'ওমর খৈয়াম' (১৯৩০)। তাঁর শিল্পকর্মের পাশাপাশি তিনি একজন বিশিষ্ট লেখকও ছিলেন, বিশেষ করে শিশুদের জন্য লেখা 'রাজকাহিনী' ও 'খীরের পুতুল' তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

শিল্পের ধারা: তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার অধীনে প্রচলিত পাশ্চাত্য শৈলীর বিপরীতে মুঘল ও রাজপুত ঐতিহ্যকে ব্যবহার করে একটি জাতীয়তাবাদী ভারতীয় শিল্পরীতি তৈরি করেন, যা বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট নামে পরিচিতি লাভ করে।

প্রভাব: অজন্তা গুহার শিল্পকলা এবং জাপানি চিত্রকলার প্রভাব তাঁর কাজে লক্ষ্য করা যায়।

উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম: ভারত মাতা, শকুন্তলা, ওমর খৈয়াম, শাহাজাহানের শেষ দিন, আরব্য রজনীর গল্প, শেষযাত্রা, কুটুম কাটাম (বিমূর্ত রূপসৃষ্টি),

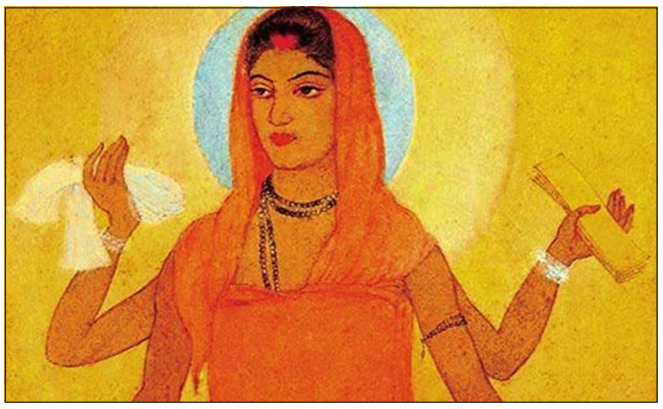

সাহিত্য ও অন্যান্য কাজ: শিল্পকলার পাশাপাশি তিনি একজন সফল লেখকও ছিলেন।

তাঁর লেখালেখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: শিশুতোষ গল্প: রাজকাহিনী, বুড়ো আংলা, নালক, ক্ষীরের পুতুল

শিল্প বিষয়ক রচনা: বাংলার ব্রত, ভারতশিল্পে মূর্তি

অন্যান্য: শকুন্তলা (সাহিত্যকর্ম), আপনকথা

শিক্ষকতা: তিনি ১৯০৫ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত সরকারি আর্ট স্কুলের কার্যনির্বাহী অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর ছাত্ররা ছিলেন যামিনী রায়, নন্দলাল বসু, মুকুল দে-এর মতো গুনী শিল্পীবৃন্দ।

অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী তিন

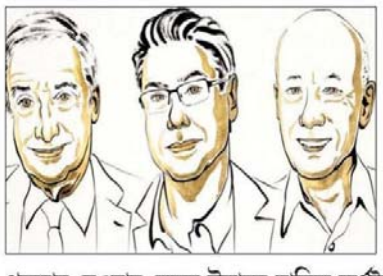

■ ২০২৫ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন তিন অর্থনীতিবিদ জোয়েল মোকির, ফিলিপ আগিয়ন এবং পিটার হাউইট। 'সুইডিশ রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস' এবছর পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন-চালিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নোবেলজয়ী জোয়েল আমেরিকার নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। ফিলিপ লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স ও পিটার আমেরিকার ব্রাউন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক।

মহামানবের দুর্গাপূজা

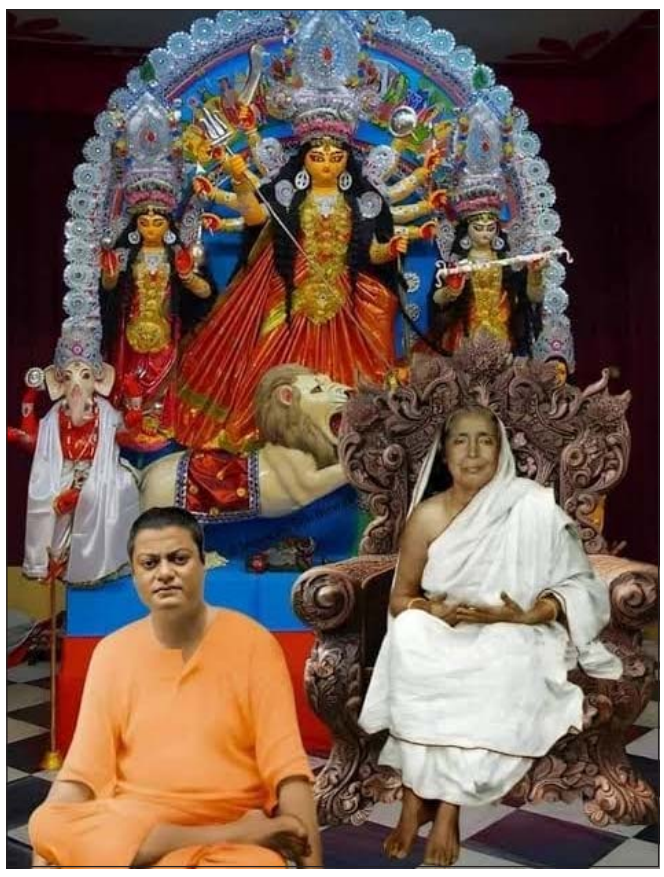

১৮৯৮ সাল। চিকাগো থেকে ফেরার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। স্বামীজী বসে আছেন বেলুড় মঠের গঙ্গার তীরে। শীতের বিকালের শেষ রোদ গঙ্গার ঢেউয়ের বিভঙ্গে লুকোচুরি খেলছে তখন। স্বামীজীর পাশেই বসে আছেন, তাঁর বিদেশীনী শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা। নৈস্বর্গীক নিস্তব্ধতা ভেঙে, জলদগম্ভীর কণ্ঠে স্বামীজী বলে উঠলেনঃ - নাঃ সিস্টার! এই ভাবে বসে বসে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছেনা!

সিস্টারঃ - বলুন স্বামীজী কি করতে হবে?

স্বামীজীঃ - সারা পৃথিবী কে আমি ভারতীয় দর্শন তো বোঝালাম। কিন্তু আমি নিজে কি আজও ভারত মা কে জানা চেনার চেষ্টা করেছি? ভাবছি পায়ে হেঁটে আমি ভারত মা কে দর্শন করবো। তুমি কি পারবে আমার সঙ্গে যেতে?

সিস্টারঃ - এ তো আমার পরম সৌভাগ্য স্বামীজী! এই দেশটাকে আমি আমার নিজের দেশ ভেবে সব ছেড়ে চলে এসেছি। এই দেশকে চেনা জানার সৌভাগ্য আমি অর্জন করতে চাই। যত কষ্টই হোক, আমি আপনার সঙ্গে যাব স্বামীজী।

যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। দক্ষিণের কন্যাকুমারী থেকে শুরু হলো পায়ে হেঁটে ভারত দর্শন। গন্তব্য উত্তরের কাশ্মীর উপত্যকা। টানা প্রায় ৬ মাস পথ চলে, অক্টোবরে স্বামীজী পৌঁছালেন কাশ্মীর। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর তখন প্রায় চলছেনা, একটু বিশ্রাম চাইছে। উপত্যকার একটা ফাঁকা মাঠের পাশে একটা পাথরের খন্ডের উপর বসে ক্ষণিক বিশ্রাম নিচ্ছেন স্বামীজী। সামনের মাঠে খেলা করছে কয়েকটি স্থানীয় শিশু কিশোর। একটি বছর পাঁচেকের শিশুকন্যাও তাদের মধ্যে রয়েছে। ঐ কন্যাটির দিকে একদৃষ্টে দেখছেন স্বামীজী।

কন্যাটির মা, তাঁর মেয়েকে ডেকে, একটি পাত্র করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। মেয়েটিও খাবারটি সবে মুখে তুলতে যাবে।

এমন সময়ে, আরও দূর থেকে, আরও ছোট একটি ছেলে চিৎকার করে নিজেদের ভাষায় কিছু একটা বলতে বলতে মেয়েটির কাছে ছুটে এলো।

মেয়েটি নিজের মুখের খাবারটা রেখে দিলো আবার পাত্রের মধ্যে। খাবার সমেত পাত্রটি এগিয়ে দিলো ঐ ছেলেটির দিকে।

স্বামীজীও উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন! চিৎকার করে বললেন - সিস্টার আমি পেয়ে গেছি!

সিস্টারঃ - কি পেলেন স্বামীজী?

স্বামীজীঃ - মা দূর্গাকে পেয়ে গেছি। ভারত মা কে খুঁজে পেয়েছি।

স্বামীজীঃ - ঐ দ্যাখো সিস্টার! যে মেয়েটা নিজের মুখের খাবার, হাসতে হাসতে ভাইয়ের মুখে তুলে দিতে পারে, যুগ যুগ ধরে সেই তো আমার মা দূর্গা। সেই তো আমার ভারত মাতা।

স্বামীজীঃ - সিস্টার, তুমি পূজার উপকরণ সাজিয়ে ফেল। আগামীকাল দূর্গাপূজার অষ্টমীতে এই মেয়েটিকেই আমি ক্ষির ভবানী মন্দিরে, দূর্গার আসনে বসিয়ে কুমারীপূজা করবো। আমি যাচ্ছি মেয়েটির বাবার সঙ্গে কথা বলতে।

হঠাৎ স্বামীজীর রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাশ্মীরী পন্ডিত।

স্বামীজী, আপনি দাঁড়ান।

পন্ডিতরাঃ - স্বামীজী, আপনি না জেনে বুঝেই ভুল করতে যাচ্ছেন। ঐ মেয়েটিকে আপনি কখনোই দূর্গা রূপে পূজা করতে পারেন না। ওর জন্ম মুসলমান ঘরে। ওর বাবা একজন মুসলমান শীকারা চালক, ও মুসলমানের মেয়ে।

স্বামীজীর কান দুটো লাল হয়ে গেছে। চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠেছে।

গম্ভীর গলায় স্বামীজী বললেনঃ - আপনারা আপনাদের মা দুর্গাকে হিন্দু আর মুসলমানের পোষাক দিয়ে চেনেন। আমি আমার মা দুর্গাকে অন্তরাত্মা দিয়ে চিনি। ঐ মেয়েটির শরীরে হিন্দুর পোষাক থাক বা মুসলমানের পোষাক, ওই আমার মা দুর্গা। আগামীকাল ওকেই আমি দুর্গার আসনে বসিয়ে পূজা করবো।

পরের দিন সকাল। দুর্গাপূজার অষ্টমী। ক্ষির ভবানী মন্দিরে ঘন্টা বাজছে, শাঁখ বাজছে।

মুসলমানের মেয়ে, বসে আছে দুর্গা সেজে। পূজা করছেন, হিন্দুর সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ। পূজার উপকরণ সাজিয়ে দিচ্ছেন, খ্রীষ্টান ঘরে জন্ম নেওয়া ভগিনী নিবেদিতা।

এই হলো মহামানবের দুর্গা পূজা। এই হলো মানবিকতার দুর্গা পূজা। মা আমাদের সবার। জাত ধর্মে নির্বিশেষে সবার। মা র কোনো জাত ধর্মে নেই, থাকে না।

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির

আনন্দ-অঙ্গন

সম্পাদকীয়

আলোর উৎসব দীপাবলি

দীপাবলি আলোর উৎসব। দীপাবলি অশুভ শক্তি নাশেরও উৎসব। এই উৎসবের উৎপত্তি বা শুরুর কারণ এবং সময় সম্বন্ধে সঠিক তথ্য না মিললেও, নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে দীপাবলি একটি অতি প্রাচীন উৎসব। বেদে দীপাবলি উৎসবের উল্লেখ না মিললেও, 'পদ্মপুরাণ' এবং 'স্কন্ধপুরাণে' দীপাবলির উল্লেখ পাওয়া যায়।

দীপাবলি হল ভগবান রামচন্দ্রের দীর্ঘ বনবাসের পরে নিজ নগরী এবং নিজ গৃহে ফেরার দিন। ভগবান বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠে দেবী লক্ষ্মীর কাছে ফেরা এবং ভগবান বিষ্ণু এবং দেবী লক্ষ্মীর বিয়ের দিনও দীপাবলি হিসাবে পরিচিত।

এই দিন জীবনের অমানিশা দূর করার কামনা নিয়ে আমরা অন্ধকারে দীপ জ্বালাই। বিশ্বাস রাখি যে দীপের আলোয় আমাদের ভাগ্যও আলোকিত হবে। অশুভ শক্তি নাশকারিণী দেবীর আরাধনার মাধ্যমে অশুভ শক্তি নাশ করে শুভ শক্তি প্রাপ্তি কামনার উৎসব হল দীপাবলি। এই দিন অলক্ষ্মীকে বাড়ি থেকে বিদায় করে অর্থ, সম্পদ এবং সমৃদ্ধি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দেবী মহালক্ষ্মীর উপাসনাও করা হয়।

অণু গল্প

বুদ্ধির্যস্য

পার্বতী ভট্টাচার্য

পার্থর এই এক বড়ো দোষ। ভীষণ আড্ডা প্রিয়। যেখানে যাবে, সেখানেই বন্ধু জুটিয়ে নেবে। মাস দুয়েক সবে শিকার পুরে ট্রান্সফার হয়ে এসেছে। নতুন অফিসেও একেবারে জমিয়ে রেখেছে। ছুটির পর এক,দু' ঘন্টা আড্ডা মেরে তবে বাড়ি ফিরবে। বিশাখা বেচারি একেই একটু ভীতু। তার উপর এই বাড়িটা একদম শহরের শেষ প্রান্তে, নির্জন এলাকায়। সন্ধ্যার পর বেশ গা ছমছম করে। কিন্তু,পার্থ যে কে সেই। বরং ওকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে ওর ভীতু স্বভাবের জন্য।

একদিন রাত সাড়ে আটটায় কলিং বেল শুনে দরজা খুলেই বিশাখা বললো, 'ও তুমি! আমি ভাবলাম রুনু দা এসেছে।'

— ' রুনু দা, সে আবার কে?'

— 'ঐ যে গো, রোজ সন্ধ্যাবেলায় আমার সঙ্গে গল্প করতে আসে। কি সুন্দর দেখতে,আর কি ভালো ব্যবহার। রোজ কিছু না কিছু খাবার আনবেই, কোনোদিন চাইনিজ, কোনোদিন মোগলাই, আজকে তো ফুচকা খাওয়াতে নিয়ে যাবে বলেছে। আজ অবশ্য হবে না। তুমি এসে গেলে। কালকে যাবো। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। কি মজার মজার কথা বলে না, হাসতে হাসতে একেবারে —'

বিশাখার খিল খিলিয়ে হাসি আর মোহিনী সাজ দেখতে দেখতে হতভম্ব পার্থ ফ্রেশ হতে টয়লেটে ঢুকলো।

তার পর থেকে পার্থ আর কোনদিন দেরী করে বাড়ী ফেরেনি।

স্বপ্ন

সুশীল মণ্ডল

নিঃশব্দ স্বপ্ন হাঁটে আমার বুকে পিঠে মাথায়
স্বপ্নে পুজো থাকে, পাশাপাশি থাকে চুম্বন।

দুপুর রাতে নামহীন কত নক্ষত্র
কত হরিণ শিশু
নানা প্রহর ধরে আমার স্বপ্নকে
আলুথালু করে দেয়।
স্বপ্নের প্রচণ্ড ছটফটানি থেকে
আমি একেক রাতে জোনাকির আলো মুখে মেখে কাম ক্রোধে মোড়া
জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চাই
হয়ে ওঠে না।

রবিশঙ্করের সেতারের মূর্ছনা
আমার স্বপ্নকে হাতছানি
দিয়ে নিয়ে যায়
ইস্রাইলের নিস্প্রাণ হাসিমুখ শিশুটির ঠিক ঠোঁটের কোণটিতে।

ঢাকের বাজনায় মায়ের পুজো

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার

ঢাকের বাজনায় মায়ের পুজো হলো বাঙালির শারদোৎসবের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেখানে ঢাকের শব্দ ছাড়া দুর্গাপূজার আমেজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

এই ঢাকের বোলের মাধ্যমে মা দুর্গার আগমনের বার্তা দেওয়া হয় এবং আরতি, বিসর্জন সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ঢাকের তালে নেচে ওঠে মন, যা এক বিশেষ উৎসবের আমেজ তৈরি করে।

উৎসবের আমেজ: ঢাকের আওয়াজ শুনলে সবার মনে পুজোর আনন্দ ও উন্মাদনা তৈরি হয়, যা পুজোকে একটি বিশেষ মাত্রা দেয়।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি: ঢাক বাঙালি সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটি ছাড়া দুর্গাপূজা ভাবাই যায় না।

দেবীর আগমন: ঢাকের বোলে মা দুর্গার আগমন বার্তা দেওয়া হয়, যা এক ধরনের মঙ্গল ধ্বনি হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহার: মহালয়া থেকে শুরু করে পুজোর বিভিন্ন সময়ে, যেমন দেবীর আরাধনা, আরতি ও দেবীর বিসর্জনের সময়ও ঢাকের বাজনা অপরিহার্য।

ঢাকের বাজনা শুধুমাত্র একটি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ নয়, এটি মা দুর্গার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার এক প্রতীক।

বাদ্যযন্ত্রের ভিড়েও ঢাকের নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে এবং এর শব্দই পুজোকে এক আলাদা অনুভূতি দেয়।

শিল্পী ও শিল্পকর্ম

শিল্পী হয়েই জন্ম হয়' — অর্থাৎ, একজন শিল্পী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন— এই কথাটির অর্থ হলো কিছু মানুষের জন্মগতভাবে শিল্পের প্রতি বিশেষ প্রতিভা থাকে, যা তাদের অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে এবং একটি বিশেষ গুণ হলো জন্মগত প্রতিভা। তবে, এটি সম্পূর্ণ ধারণা নয়। একজন শিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করার জন্য জন্মগত প্রতিভার পাশাপাশি কঠোর পরিশ্রম ও নিরন্তর অভ্যাসের প্রয়োজন।

জন্মগত প্রতিভা এবং শিল্পী হওয়া:

প্রাকৃতিক দক্ষতা: কিছু মানুষ শৈশব থেকেই গান, নাচ, ছবি আঁকা বা অন্য কোনো শিল্পকলায় বিশেষ দক্ষতা নিয়ে জন্মায়। এই জন্মগত প্রতিভা তাদের অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখে।

সৃজনশীলতা: অনেক শিল্পী জন্মগতভাবে সৃজনশীল হন, যা তাদের শিল্প সৃষ্টির জন্য অনুপ্রাণিত করে।

শিল্পের পথে উন্নতি:

কঠোর অনুশীলন: শুধু জন্মগত প্রতিভা থাকলেই একজন শিল্পী হওয়া যায় না। এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত অনুশীলন এবং শিল্পকে উন্নত করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা।

অভিজ্ঞতা: জীবনের নানা অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা একজন শিল্পীর কাজকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

প্রশিক্ষণ: বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালা শিল্পীর দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে।

সুতরাং, 'শিল্পী হয়েই জন্ম হয়' — এই উক্তিটি শিল্পীর জন্মগত প্রতিভার গুরুত্ব বোঝায়, কিন্তু এটি শিল্প তৈরির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে না। জন্মগত প্রতিভার সাথে পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনই একজন ব্যক্তিকে সফল শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলে।

ভারত গৌরব সম্মানে ভূষিত বাংলার ৩০ গুণীজন

বেঙ্গল ক্রিয়েটিভ ক্লাব ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সমন্বয় কেন্দ্রর উদ্যোগে ১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভাঘরে বাংলার ৩০ জন গুণীকে ভারত গৌরব সম্মান দেওয়া হয়। শুরুতে বেঙ্গল ক্রিয়েটিভ ক্লাবের সভাপতি সুরথ চক্রবর্তী জানান, এই সম্মাননা শুধু পুরস্কার নয়, এটি ভারতের গৌরবকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার অঙ্গীকার।

বিশেষ অতিথি ছিলেন শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রবীরকৃষ্ণ দেব, তালবাদ্য শিল্পী মল্লার ঘোষ, বিগ্রেডিয়ার তুষারকান্তি মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দীপ চট্টোপাধ্যায় ও আরো বিশিষ্টরা। এদিনের সম্মান প্রাপকদের মধ্যে ছিলেন (২০২৬ সালে পদ্মশ্রী মনোনয়নের জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত ৩০ জন)— প্রবীরকুমার বিশ্বাস,সিপ্তি সরকার, সরোজ ভট্টাচার্য, উত্তম দেবনাথ, শিবসৌম্য বিশ্বাস, বিকাশ বসাক, সঙ্ঘমিত্রা ব্যানার্জি, মন্দিরা মুখার্জি ব্যানার্জি, শুভ্রা ঘোষ, নাজনিনা সুলতানা, কৃষ্ণা পাত্র, পরিমলচন্দ্র মজুমদার, হিমেন্দু দাস, মহাদেব গুড়িয়া, তরুণকান্তি মন্ডল, মহুয়া সাহা, স্বপনকুমার রুইদাস, সুনীতা রায় প্রধান, লেখা মন্ডল, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, আব্দুল কাদের, ড. অনিরুদ্ধ পাল, ড. অমৃতলাল বিশ্বাস, শর্মিষ্ঠা রায়চৌধুরী, পণ্ডিত সুভাষ সিংহ রায়, আশুতোষ মজুমদার, মানিক পোদ্দার, শংকর দাস ও ড. শ্যামলকুমার দাস।

সুচরিতা চক্রবর্তী

কবিতা ১

সকল শূন্যতার ভাষা ব্যকরণ মস্তিস্কে
শতছিদ্র করে দিতে চায়
এক বাস ভীড়ে তুমি কি দেখেছো কত
মুখ গলে যায়!
তুমি দেখো নি চোয়ালের নিচে কার
কতখানি ব্রহ্মাণ্ড পেষণ হয়।

এতোকিছুর পরে ফ্যাকাসে চামড়ার
ভেতর আমি গুটিশুটি মেরে পড়ে
আছি।

কবিতা ২

যুগের সাথে আধুনিকতার সাথে বাবা
বা বট বদলে যায় নি আজও
আমরা যতই তাকে আঘাত করি না
কেন
নিশ্চিত আশ্রয় বারংবার ফিরে আসে
আমাদের শেকড়ের কাছে।
প্রাগৈতিহাসিক কুয়ো নতুন মুখ দেখে
আকাশের আয়নায়।

মাতৃ-নিরঞ্জন

নীতা কবি মুখার্জী

আগমন-কালে দিকে দিকে ছিলো আগমনী গানে ভরা
উমা এসেছিলো বাপের বাড়ীতে পড়েছিলো তারই সাড়া।

শিউলি চুমেছে চরণদুখানি,শিশির ধুয়েছে পা
কাশফুল তাই সোহাগ-ভরে দুলিয়েছে তার গা।

জগজ্জননী মা আমাদের দনুজদলন করে
অশুভশক্তি হার মেনে তাই মায়ের চরণ ধরে।

সন্তানেরা সব মেতে উঠেছিলো, আনন্দে মাতোয়ারা
আজ বিদায়ের সুর বাজে ঐ,সবাই আকুলপারা।

সপ্তমীতে এলো মা জননী চতুর্দোলায় চড়ে
মহা-অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে পূজার মন্ত্র পড়ে।

নবমী তিথিতে কতো কিছু "বলি" অর্ঘ্য দিলাম তাঁরে
দশমী তিথিতে মিষ্টিমুখ আর বিদায় অশ্রু ঝরে।

আর দুটো দিন থেকে যাও মাগো ,ওগো আনন্দময়ী
তোমার প্রসাদে মর্ত্যবাসী যেন হতে পারে জয়ী।

বাবা-ভোলানাথ বড়ো অভিমানী ,কৈলাস আছে ফাঁকা
পার্বতী বিনা শিব কি সেখানে থাকতে পারেন একা?

নন্দী-ভৃঙ্গী যতো অনুচর সবাই যে খোঁজে মা-কে
শিবঘরণী বিনা শিবের আলয় ?যেতেই হবে তাঁকে।

বিসর্জনের বাদ্যে বাজলো অতীব করুণসুর
আকাশে বাতাসে সেই সুর ভেসে চলে যায় বহুদূর।

আনন্দময়ীর আগমনে ছিল এ ধরণী মাতোয়ারা
মা চলে গেছেন, সন্তানেরা সব হয়েছে মাতৃহারা।

আবার এসো মা-আনন্দময়ী অসুরনাশিনী তুমি
আসছে বছরে তব চরণপরশে ধন্য হবে এ ভূমি।

শরতের সকালেতে রাঙামাটির দেশে

গৌতম সরকার

শরতের সকালেতে , গ্রামগুলি দেখে।
মনে হয় তুলি দিয়ে, কেউ গেছে এঁকে।।

গগনের ঘন নীলে ,সাদা মেঘ ভাসে।
নদী মাঠ ধার ঘেঁষে, কাশফুল হাসে।।

মাঝে মাঝে লাগে বেশ, তাল গাছ গুলি।
ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা বক, আর বুল বুলি।।

সবুজ ধানের ক্ষেত, দিগন্ত জুড়ে।
এঁকে বেঁকে রাঙা পথ , চলে গেছে দূরে।।

সব কিছু লাগে যেন, ছবির মতন।
এক ধারে বন ঝাউ , আর শালবন।।

শরতের সকালেতে , গ্রামগুলি দেখে।
মনে হয় তুলি দিয়ে, কেউ গেছে এঁকে।।

পরম্পরা

সুব্রত দাশ

বৃষ্টি ধোয়া রাজপথে
হাঁটে মায়াবী মিছিল
আলোর ঠিকানায়,
হাত ধরাধরি করে
পার হয় জেব্রা ক্রসিং,
পরম বিশ্বাসে,
স্বপ্নের ফেরিওয়ালারা
পসরা সাজিয়ে ডাকে
নিবিড় উষ্ণতায়;

প্রলোভনের রঙিন সম্ভার...
মানুষ দেখে, শোনে ,কেনে
তারপর একদিন
সবই বোঝে!

এভাবেই চলে সময়ের
সবচেয়ে বড়বাজার,
এক দিক শূন্যতার অন্ধকারে

ওদের আমি

সুপর্ণা পাল বণিক

তেমন কিছুই করিনি আমি ওদের জন্য কখনও
তবু ওরা আমায় সাহায্য করে চলেছে
ভুলিয়ে দিয়েছে দূরত্ব
বাড়িয়ে দিয়েছে ধৈর্য
উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছে সর্বদাই
ওদের ভাবনার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে আমার ভাবনা।

ওরা আমায় ভালবাসা দেয় উজাড় করে
ওদের প্রাণের কাছে পৌঁছতে আমাকে পার হয়ে আসতে হয়
গঙ্গা পদ্মা বা তিস্তা ও তোর্সা
পেরিয়ে আসি কত পঞ্চায়েত কত ব্লক জেলা আর উপজেলা
ওদের মাঝে পৌঁছে গেলে বিনিময়ে পাই ভরপুর আনন্দের ভাঁড়ার।

তখন শুধু মনে হয় গল্প বলা শহরে
হাঁপিয়ে উঠছে বয়স বাড়া শরীর...

ভয়ে ভয়ে

শমী তরফদার

কোনো এক অজানা ভয়
ভর করে আছে সকলের মনে
পাছে কেউ দেখে ফেলে,
জেনে নেয় সব গোপনীয়তা।
চোরা চাহনি, ইতিউতি চাওয়া
সংকোচের হাত কচলানি।
অতৃপ্ত মন, অন্যায়ে জড়িয়ে
তবু মেকি ন্যায় দেখনদারি।
সবাই সত্যটুকু জানে
তবু মিথ্যে দিয়ে ঢেকে রাখার
ব্যাকুল ব্যর্থ প্রচেষ্টা।
কোনো এক অজানা ভয়
মানুষের মানবিক সব গুন
গ্রাস করে নিল কোন এক ভয়?

অনুভবে

মিনতি সাউ ভৌমিক

আমি যদি মাতাল হতাম
বাঁশবাগানে জন্ম নিতাম
মাথার ওপর উঠত চাঁদ
পায়ের নীচের মাটি।
শিরশিরিয়ে বইত হাওয়া
আলোছায়ায় চাঁদের খেলা।
ঝিঁঝিঁপোকারা কইত কথা
কত গল্প, দুঃখ সুখের।
ঝরা পাতারা মরমরিয়ে
জানান দিত আসা যাওয়ার
ইঁদুর বেড়াল আরও সবার
গিরগিটিও রং বদলাত
জোনাকিদের আলোর নাচে
খোলস ছেড়ে, ডানা মেলে
প্রজাপতিরা উঠত বেঁচে।
একটু আলো, আধটু আঁধার
চমক দিত, আর কুলুকুলু,
আওয়াজ দিয়ে দেখা দিত,
ছোট বড় ঝরণাগুলো।
আঁধার চিরে চিকমিকিয়ে
দূরের দেশের প্রভাতআলো।
চোখের অন্ধ ঘুচিয়ে দিত,
উঠত জেগে লালের গোলা
আলোর চাপে আকাশ ফুঁড়ে।

অনুভব

জয়ন্ত সাহা

পোড়ো বাড়িটার চাতাল জুড়ে আলোময় ছায়া
অন্ধকারের সঙ্গে সহবাস
আলোর রকমারি সাজে বেমানান এই জায়গাটা
সাইনবোর্ডে ঝুলছে 'বিপজ্জনক বাড়ি'
সিমেন্টের আস্তারণ খসে খসে ফ্রেমভাঙা জানালার গায়ে
বিকেলের রোদ
তবুও বেশ লাগে
ঝরা পাতার ঢেউয়ে দুলতে দুলতে
ওই পোড়ো বাড়িটার হৃৎপিণ্ডে সময়ের ধারাপাত শুনি
কখন যে সন্ধে নেমেছে বুঝতে পারিনি
আস্ত বাড়িটা গিলে খায় আমায়
নতুন এক সভ্যতার মৃদঙ্গ বাজে বিরহ নগরে
অজস্র বিয়োগ চিহ্ন চারদিকে শুধু।

কলঙ্কিত ভূস্বর্গ

রঞ্জনা মন্ডল

ভূস্বর্গে অভিশাপ লেগেছে
তাজা রক্তে রেঙে উঠেছে কাশ্মীর!
ধর্মের লেলিহান শিখায় অকাল আহুতি;
উত্তর-পশ্চিম আকাশ লালে লাল...
আচমকা গুমরানো কান্নার হাহাকার!

ঘুনপোকা দেশের বুকে যুগ যুগ ধরে
রাজনীতির তকমাও পিছু পিছু হাঁটে,
সর্ব ধর্মের সমন্বয়ে গড়া দেশ মুখ থুবড়ে পড়ল,
এক নিমেষে গুড়িয়ে গেল শৃঙ্খলের বেড়াজাল....
আত্ম-গরিমা সিন্ধুর বুকে বিসর্জিত।

শত্রুর লোলুপ দৃষ্টি ভূস্বর্গে
টিউলিপের পাপড়ি আজ রক্তাক্ত!
শান্তির পহেলগাঁও হয়েছে কলঙ্কিত
নয়ন ভোলানো রূপ ঘোমটায় মুখ লুকালো...
হায়রে! এই কি আমার স্বপ্নের ভূস্বর্গ??

পরিযায়ী

পার্বতী ভট্টাচার্য

অন্ধকার এই চৌকাঠ টা পার হতে পারছিনা কিছুতেই।
পিছুটান আমাকে আঁচল টেনে ধরে রাখে।
কিন্তু, আমি যে ভালোবাসি ভ্রমর, পাখির গান,
সাগরের ঢেউ, নদীর কলতান।
আকাশ আমাকে ডেকে যায়,
খোলা মাঠে হাওয়া আমায় খুঁজে বেড়ায়— ।
জানো,এসব কথা কেউ বোঝেনি
আমার চারপাশ টা কেবল বোবা চোখে তাকিয়ে থাকে।
বোঝে একজন - সেই পিছুটান।
সে জানে মুঠি আলগা হলেই
আমি হতে পারি পরিযায়ী।

সময়

তাপস ওঝা

কী কথা হয়েছিল কারও মনে নেই!

সরকার বাগান ধ্বংস হয়ে কেমন পতিত
হয়ে আছে
বয়সের গাছ-পাথরের চিহ্নমাত্র নেই,
দুজনেই বেঁচে আছি পাশাপাশি খাটে।

কালীপূজা ও দীপাবলি উৎসব

কালীপূজা ও দীপাবলি একই দিনে পালিত হয়, যেখানে দীপাবলি মূলত আলোর উৎসব এবং কালীপূজা এই উৎসবের অংশ হিসেবে দেবীর আরাধনা করা হয়।

বাঙালিরা এই দিনটিকে দেবীর পূজা করে, যিনি অশুভ শক্তি বিনাশকারী হিসেবে পূজিত হন, যেখানে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এই দিন লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই উৎসবই কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে পালিত হয়।

মূল পার্থক্য ও সম্পর্ক

দীপাবলি: দীপাবলি শব্দের অর্থ 'আলোর উৎসব'। এটি অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তির আগমনের প্রতীক। অন্ধকার দূর করার জন্য এই সময় সবাই প্রদীপ ও আলো জ্বালায়।

কালীপূজা: দীপাবলির দিন রাতে বাঙালি, অসমীয়া এবং ওড়িয়ারা দেবী কালীর আরাধনা করেন।/দেবী কালীকে অশুভ শক্তির বিনাশকারী এবং শক্তি ও সমৃদ্ধির দেবী হিসেবে পূজা করা হয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কালীপূজাকে জনপ্রিয় করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং তখন থেকেই দীপাবলির দিনে এই পূজা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

দীপাবলির অন্য রূপ

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, যেমন উত্তর ভারতে, এই দিনটি মূলত লক্ষ্মীপূজা হিসেবে পালিত হয়।

এছাড়াও, এই সময়ে ধনতেরাস, নরক চতুর্দশী এবং ছোট দীপাবলিও পালিত হয়, যা বিভিন্ন বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত।

আগমনী

ভবতোষ গায়েন

দু'টিতে এতই ভাব আর কোথাও দেখিনি।
একজন এলে- আর একজন
কিছুতেই মুখ ঘুরিয়ে থাকতেই পারে না। জোৎস্না মাখা মিষ্টি হাসি
তার ঠোঁটের কোনে লেগেই থাকে।
যে দোলার উৎস ছিল হৃদয়ের অন্দরে, এখন দুলে উঠেছে
মাঠ- ঘাট জলের উপরে শিরশিরিয়ে খুব সকালে,
কাশের বনে। বিকেল বেলা,মেঘে মেঘে দলে দলে
অভিসারে আকাশযানে উড়ে উড়ে
সাত সমুদ্র পেরিয়ে শরৎ এলো ভোরের বেলা
শিউলি তলে; আধো আলোয় চোখে চোখ পড়তেই সবুজ
দুর্বার ডগা বেয়ে গড়িয়ে পড়া শীতল শিশির বিন্দুর
মতো হালকা একটা শিহরণ,
দু'জনে কী ভাব!
দুইটি হৃদয়ের পরশে সমস্ত গ্রাম জুড়ে
এক নৈসর্গিক আনন্দ,
বেজে উঠল- ঢ্যাং কুড়াকুড়, ঢ্যাং কুড়াকুড়
ঢাকের কাঠিতে আগমনী।

বিদ্যাসাগর

স্বামী শিবপ্রদানন্দ

বুকের মধ্যে ঝড় উঠেছে হুলুস্থুল,
নদীর বানে নৌকা দুলছে ভাঙছে কূল।
হাল ধরেছে মেরুদণ্ডে ধুতি-চাদর
বাঙালিকে বাঁচতে শেখায় বিদ্যাসাগর।

বজ্রকঠিন পাত্রে রাখে অশ্রুধারা,
বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে ভাঙে অন্ধকারা।
বর্ণমালায় ঢেউ তুলে যায় স্বপ্ন-আগর
দুঃখ-বিষাদ তুচ্ছ করে বিদ্যাসাগর।

আকারে সে খর্ব হলেও গর্ব প্রচুর,
অকুতোভয়, তোয়াক্কা নেই কোন কিছুর।
ভাঙলে মূর্তি নেই তো মোটেই কাতরতা
ললাটে তার লেখাই আছে অমরতা।

অমিত বিশ্বাস, হালদার আর্ট একাডেমী

ক্যারোলিন দাস, ভাস্কর চিত্রকলা

মানালি অধিকারী
চিত্রাঙ্গন আর্ট একাডেমী

সৃজা সরকার
বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

সুজিত সরকার
বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

শ্বেতা বিশ্বাস
চিত্রশৈলী আর্ট একাডেমী

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

ঘোলা, সোদপুর, কলকাতা-৭০০ ১১১
যোগাযোগ ঃ 8617847889/9382831611/ 9874566708/8910739009
Email : shilpakalaparishad@gmail.com
Whatsapp: 8617847889/9874566708

ব্রাঞ্চ অফিস ঃ এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২, যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮
Facebook : sarbabharatiya shilpakala parishad

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

বর্তমানে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকা চিত্রশিল্পী, অঙ্কন শিক্ষক, শিক্ষিকার দ্বারা প্রশংসিত। এই প্রতিষ্ঠান শিল্পীর শৈল্পিক স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলবে সৃষ্টির প্রেরণার মাধ্যমে।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের শিল্প সমৃদ্ধ পাঠাগার, শিল্পকলা ও অঙ্কন শিল্পীদের অধ্যয়ন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার কর্তৃক এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।
যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮ (মোঃ ও হোয়াটস্অ্যাপ)। সম্পাদক ঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার। E-mail : k.sarkar151071@gmail.com